এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশ (Psycho-social Development)

শিশুর নিজস্ব সুপ্ত ক্ষমতা এবং যথাযথ পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে শিশুর বিকাশ। ব্যক্তির বিকাশে ব্যক্তিগত বৈষম্য এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের **দুটি** গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া সামাজিক প্রতিনিধি (social agents) যেমন—পরিবার, বিদ্যালয়, সহপাঠী, গণমাধ্যম, ক্লাব প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। জার্মান মনোবিদ এরিকসন সর্বপ্রথম এই ধারণার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। এরিকসন ছিলেন ফ্রয়েডের ছাত্র। তিনি বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফল থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্যক্তির বস্তু ক্ষোভজনিত (Emotional Problems) সমস্যার মূলে রয়েছে পরিচয়ের বিভ্রান্তি (Identity confusion)। এরিকসন মনে করেন ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব মূলত অহমের (Ego) চাহিদা এবং সমাজের চাহিদার সংঘাত। এরিকসনের মতে, পরিবেশের চাহিদা এবং ব্যক্তির সক্ষমতার সংগতি স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার ফলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ সম্ভব। সহজকথায় ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সংগতিস্থাপনের ক্ষমতাই ব্যক্তিত্ব গঠনের নির্ণায়ক (''Personality develops according to one's ability to interact with the environment'')।

জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। এরিকসন ব্যক্তির জীবনকালকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(১) প্রারম্ভিক পর্যায় (Early years)
(২) মধ্যবর্তী বা প্রাক্ বয়ঃসন্ধি পর্যায় (Middle years)
(৩) বয়ঃসন্ধি বা কৈশোর পর্যায় (Adolescent years)
(৪) পরবর্তী পর্যায় (Later years)

এই চারটি প্রধান পর্যায়ের মধ্যে **আটটি** উপপর্যায় বিদ্যমান হয়।

প্রারম্ভিক পর্যায় (Early years) :

এই পর্যায়টি তিনটি উপপর্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথম স্তর (০-১ বছর) ঃ আস্থা বনাম অনাস্থা
First Stage (0-1 Year) : Trust Vs. Mistrust

সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক নিজের প্রতি এবং বিশ্বের সকল কিছুর প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস। সকলের প্রতি ও নিজের উপর এই আস্থার সূত্রপাত জীবনের প্রথমদিকে শিশু পারিপার্শ্বিক থেকে কীরূপ ব্যবহার পায় তার উপর। যদি শিশু জীবনের প্রথম বছরে যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপত্তা ও যত্ন পায়, যদি মা, বাবা ও পরিবারের

অন্যান্য লোকেদের থেকে যথেষ্ট ভালোবাসা ও নৈকট্য পায় তবে তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বেশি অনুভূত হয়ে থাকে।

যে শিশুর শারীরিক বিকাশ যথাযথভাবে হয় সে স্বাধীনভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়। ফলে সে নিজের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে এবং তার নিরাপত্তাবোধেরও বৃদ্ধি হয়। ফলে তার কাছে তার পরিবেশ অনেক বেশি সুরক্ষিত ও নিরাপদ বলে মনে হয়। এই অনুভূতির ফলে শিশু নিজের ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। এটিই সুস্থ, সাম্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম ধাপ।

অপরদিকে বলা যায়, যে শিশু মা, বাবা ও পরিবার থেকে সেইভাবে প্রগাঢ় ভালোবাসা পায় না, যে শিশু নিরাপত্তা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত তাদের নিজের প্রতি ও সকলের প্রতি এক অনাস্থার মনোভাব গড়ে ওঠে। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বাভাবিক ও সুন্দর হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ব্যতিক্রমী শিশুরা পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কাছ থেকে সাধারণত সাদর অভ্যর্থনা পায় না। ফলে তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়, আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাদের স্বাধীনভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে সে নিজের প্রতি ও সকলের প্রতি অনাস্থাশীল হয়ে ওঠে। সে পরিবেশকে নিরাপদ বলে মনে করে না। সে তার চারপাশের মানুষজনকে বিশ্বাস করতে পারে না। ফলে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিক, সুন্দর হয় না।

দ্বিতীয় স্তর (২-৩ বছর) ঃ স্বাধীনতা বনাম লজ্জা, সন্দেহের দ্বন্দ্ব
Second Stage (2-3 Years) : Autonomy Vs. Shame, Doubt

এই স্তরের সূত্রপাত শিশুর প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে। এই স্তরে ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয় নিজের প্রাত্যহিক কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে। এই স্তরে শিশুর নিজের কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত যেন তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।

এই স্তরের শিশুরা যখন প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজগুলি নিজে সম্পন্ন করতে পারে তারা অনেকাংশেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এইক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকদের উচিত তত্ত্বাবধান করা কিন্তু তাতে যেন শিশুর আত্মবিশ্বাস নষ্ট না হয়। অভিভাবকদের সকল কাজে বাধা দেওয়া বা সবকাজ নিজে করে দেওয়া উচিত নয়।

এই স্তরের যেসব শিশুরা নিজের প্রাত্যহিক কাজ নিজেরা কারোর সাহায্য ছাড়া করতে পারে না, তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্য ঃ

(1) কখনোই শিশুর অপারগতা বিষয়ে শিশুকে অপমান করা উচিত নয়। শারীরিক বা মানসিক কোনোভাবেই তাকে সকলের সামনে লজ্জা দেওয়া উচিত নয়।

(2) তবে দেখা উচিত শিশুর মধ্যে যেন নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে। সে যেন যথেচ্ছাচার না করে।

(3) শিশুর আত্মবিশ্বাস জাগাবার জন্য শিশুকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দেওয়া উচিত। ফলে তাদের পরনির্ভরতা অনেকাংশে কমে যাবে। কাজের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বাড়বে ফলে তাদের আত্মশ্রদ্ধা, স্বাধীনতা বেড়ে যাবে। ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ভালোভাবে হবে।

(4) বড়োদের এমনভাবে আচরণ করতে হবে, যাতে তাদের আচরণ শিশুদের অনুকরণীয় হয়। যেহেতু বাচ্চারা মূলত অনুকরণের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখে, তাই বড়োদের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে শিশুরা সেই আচরণ অনুকরণ করতে পারে।

অভিভাবকের অযৌক্তিকভাবে শাস্তি বা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কারণ যদি শিশু কোনটি অন্যায় বুঝতে না পারে এবং শাস্তি ভোগ করে তবে তাদের মনে এক ভয়ের জন্ম নেয় এবং সেই ভয় অন্যান্যদের উপরও আরোপিত হয় এবং সে তার সমস্যা বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না এবং ফলস্বরূপ যথাযথ সমাধানও পায় না। শিশুর অহেতুক ভয় দূর করার জন্য বড়োদের উচিত তাদের কথা মন দিয়ে শোনা, সরলভাবে যুক্তি দিয়ে তা বোঝানো এবং যথাযথ উদাহরণ দেওয়া।

তৃতীয় স্তর (৪-৫ বছর) ঃ উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা বনাম অপরাধবোধ
Third Stage (4-5 Years) : Initiative Vs Guilt

এই স্তরে শিশুদের মধ্যে ভাষার বিকাশ বা ভাষার মাধ্যমে নিজের চাহিদা এবং মত প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। তাদের চলাফেরায় স্বাধীনতা, ভাষার ত্রুটিহীনতা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। ফলে তাদের মধ্যে একটি উদ্যোগ দেখা যায় যার দ্বারা সে তার ইচ্ছা কার্যে প্রয়োগ করতে চায়। বিভিন্ন কাজকর্ম, খেলা ইত্যাদির দ্বারা শিশুর প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ শিশুর বিভিন্ন আশার সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে যদি শিশুদের মত, চিন্তাধারা ও উদ্যমকে অস্বীকার বা উপহাস করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে এক ধরনের লজ্জা, অপরাধবোধ কাজ করে। কিছু করতে গেলেই শিশুরা যদি কেবল বাধানিষেধের সম্মুখীন হয় তখন তারা অপরাধবোধে ভোগে, তাদের সহজ উদ্যমকে স্তিমিত করে দেয়। তারা পরবর্তীকালেও নিজেদের মত প্রকাশ করতে ভয় পায়। তাদের স্বাভাবিক আচরণের বেলাতেও সংকোচ দেখা যায়। অপরাধবোধ তাদের নিরুদ্যম করে রাখে।

তৃতীয় স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্য : এই স্তরের শিশুকে বিভিন্ন খেলাধুলায়, বাড়ির কাজ, তাদের মতামত প্রকাশ, কল্পনাশক্তি প্রকাশ প্রভৃতি কাজে তাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। এই জন্য তাদের অঙ্কন কার্য, গল্প বলা, গল্প শোনানো প্রভৃতি পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

খেলাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশ ঘটে ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে। খেলার মাধ্যমে শিশু যে কেবল আনন্দ লাভ করে তাই নয়, জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশে খেলার গুরুত্ব যথেষ্ট। তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে।

খেলা শিশুর সামাজিক বিকাশে সাহায্য করে। খেলার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা প্রকাশ, জনপ্রিয়তা বাড়ানো প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের অহংসত্তার পরিতৃপ্তি হয়। তাছাড়াও খেলার মাধ্যমে প্রক্ষোভিক বিকাশ যথাযথভাবে হয়ে থাকে।

এই স্তরে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য শিশুর দক্ষতা ও নিরাপত্তাবোধের বিকাশ ঘটানো।

মধ্যবর্তী পর্যায় (The Middle Years) :

চতুর্থ স্তর (৬-১১ বছর) ঃ উদ্যম বনাম হীনম্মন্যতা
Fourth Stage (6-11 Years) : Industry Vs Inferiority

এই স্তরের শিশুদের মধ্যে কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একধরনের ধারণা জন্মায়। নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে স্বীকৃতি চায় এবং যথাযথ স্বীকৃতি পেলে তাদের মধ্যে কর্মোদ্যম আরও বাড়ে। এই কর্মোদ্যমের ফলে তারা কিছু প্রস্তুত করতে, উৎপন্ন করতে চায়। একেই বলে উদ্যম বা Industry। এই সাফল্যের ফলে শিশু সামাজিক স্বীকৃতি পায় এবং ফলস্বরূপ তার মানসিক সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে।

অপরদিকে যে শিশুর কর্মদক্ষতা থাকে না, তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাকে সহপাঠীরা নিজেদের দলভুক্ত করতে চায় না। ফলে ওই সকল শিশুদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা যায়। তারা নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

চতুর্থ স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্য ঃ শিক্ষকদের কর্তব্য শিশুর মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা। কোনো পিছিয়ে পড়া শিশুকে নিয়ে ক্লাসে উৎসাহ সৃষ্টি করে, তার গুণগুলি অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা এবং ওই পিছিয়ে পড়া শিশুটিকে যাতে তার সহপাঠীরা তাদের দলভুক্ত করে তার চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্তব্য।

যে সমস্ত শিশুরা হীনম্মন্যতায় ভুগছে, পড়াবার সময় তাদের সহজ প্রশ্ন দিয়ে উৎসাহ করতে হবে যাতে তারা সফলতার স্বাদ পায়। ফলস্বরূপ ওই সকল শিশুদের

উৎসাহ ও কর্মোদ্যম বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষককে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, যাতে যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একধরনের পজিটিভ মনোভাব গড়ে ওঠে।

সামাজিক আদানপ্রদান এবং শিক্ষাপ্রযুক্তি
(Social Interactions and Educational Technology) ঃ

এরিকসন মনে করেন সামাজিক আদানপ্রদান ও শিশুর বিকাশ—এই দুইয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

প্রথম Computer প্রচলনের সময় এরূপ ধারণা ছিল, Computer ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ বিপন্ন হবে এবং শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক আদানপ্রদান ব্যাহত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় কম্পিউটার ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীরা সামাজিক আদানপ্রদানে তুলনামূলকভাবে অধিক পারদর্শী। বলা যায় Programming করার জন্য যেহেতু দলগতভাবে কাজ করতে হয়, তাই তাদের সামাজিক আদানপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিকাশ প্রক্রিয়া আরও ভালোভাবে হয়ে থাকে।

Internet ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং সামাজিক আদানপ্রদানের ফলে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের সমস্যাসমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

কিশোর পর্যায় (Adolescent Years) :

পঞ্চম স্তর (১২-১৮ বছর) ঃ আত্ম-পরিচয় বনাম আত্মপরিচয় বিভ্রান্তি
Fifth Stage (12-18 Years) : Identity Vs Identity Confusion

বয়ঃসন্ধি স্তরের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তনের (বিশেষত শারীরিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক) ফলে তাদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। অন্যরা তাদের কী চোখে দেখে বা তাদের সম্বন্ধে কী ভাবে এই বিষয়ে তারা ভীষণভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। বিশেষত, সমবয়সিদের মতামতকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। এই সময়ে প্রায়শই তারা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হলেই আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তিতে ভোগে। ফলস্বরূপ তারা নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে গুটিয়ে নেয় বা বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিবেশ থেকে সরে আসে।

শিক্ষক বা অভিভাবকদের চেষ্টা করা উচিত যেন এই স্তরের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে দলগত সংহতি বাড়ানো উচিত। কিশোর-কিশোরীদের যৌন সমস্যা সম্পর্কেও শিক্ষক ও অভিভাবকদের খেয়াল রাখা উচিত।

বয়ঃসন্ধি স্তরের ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। তারা এই নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারে না, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। বয়ঃসন্ধি স্তরের ছেলেমেয়েদের উপর

অভিভাবকদের আশা, আকাঙ্ক্ষার ফলে, সমবয়সিদের কাছ থেকেও বিভিন্ন রকম চাহিদা বা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশা দেখা যায়। ফলস্বরূপ তাদের মানসিক স্থিতাবস্থায় বিপর্যয় দেখা যায়। তাদের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তাহীনতা (insecurity) দেখা দেয়। তাদের প্রকৃত পরিচয় ও তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে ওঠে। যারা এই ব্যক্তিগত সংকট থেকে মুক্ত হতে পারে তারা আত্মপরিচয় অর্জন করেছে বলে মনে করে। যারা এই সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারে না তারা পরিচয় বিভ্রান্তিতে ভোগে। এরিকসনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন মারসিয়া (Marcia)। তিনি একাধিক গবেষণার (1966, 1980) উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীর পরিচয় সম্পর্কে নির্বাচন করেন নিম্নোক্ত চারটি উপায়ে—

(১) ***আবছায়া পরিচয় (Identity Diffusion)*** : পরিচয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব।

(২) ***পরিচয় নির্বাচন (Identity Foreclosure)*** : অন্যের ইচ্ছায় বিকল্পগুলির মধ্যে নির্বাচন। সাধারণত দেখা যায় অভিভাবকদের ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অথবা বন্ধুবান্ধবদের পছন্দ অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় নির্বাচন করা হয়।

(৩) ***সাময়িক পরিচয়হীনতা (Identity Moraterism)*** : এই নির্বাচনে সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখা হয় এবং যথারীতি পরবর্তী পর্যায়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না কারণ তখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা থেকে যায়।

(৪) ***পরিচয় লাভ (Identity Achievement)*** : পরিচয় সম্পর্কে বিকল্পগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং যে-কোনো পরিস্থিতিতে ওই সিদ্ধান্তে অটল থাকা।

পঞ্চম স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্য : বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি পরিবর্তন সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাদের সম্মুখে বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য রাখা দরকার যা আয়ত্ত করে তারা নিজ পরিচয় (Identity) করতে পারে। তাদের মনো-সামাজিক বিকাশ যথাযথ হওয়ার জন্য নিম্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন—

(১) এই স্তরের কিশোর-কিশোরীদের প্রাপ্তবয়স্করূপে গণ্য করা উচিত। মূলত স্বাধীনতা এবং সম্মান দেওয়া উচিত। তাদের বোঝাবার জন্য যুক্তি সহ বিষয়বস্তু উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে। এমন পরিবেশ থাকা উচিত যেখানে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে।

(২) তাদের সামনে যে লক্ষ্য রাখা উচিত তা যেন কঠিন কিন্তু অধিগম্য না হয়। লক্ষ্য যেন বাস্তবসম্মত হয়। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন যেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে প্রয়োজনীয় নিপুণতা প্রাপ্ত হওয়ার প্রশিক্ষণ যেন লাভ করে।

(৩) শ্রেণিকক্ষের বিষয়বস্তু এবং পঠনপাঠন যেন এমন না হয় যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা কেবল অসফলতা প্রাপ্ত হয়। তারা যেন উৎসাহ, আনন্দ হারিয়ে না ফেলে।

(৪) শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করতে পারে।

পরবর্তী পর্যায় (Later Years) :

ষষ্ঠ স্তর (১৮-৩৫ বছর) ঃ হৃদ্যতা বনাম একাকীত্ব
Sixth Stage (18 - 35 Years) : Intimacy Vs. Isolation.

এই স্তরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গতার বোধ তৈরি হয় এবং নিজের পরিচয়কে (identity) সঠিকভাবে বজায় রেখে সমাজের অন্যদের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। তরুণরা এই সময় তাদের পরিচয় (Identity) প্রসারিত করে। পরস্পরের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে বলা যায় এই স্তরের তরুণরা যদি অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় বা পারস্পরিক সান্নিধ্য, অন্তরঙ্গতা তৈরি না হয় তাহলে তারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবন এড়িয়ে চলে এবং তারা একাকীত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

সপ্তম স্তর (৩৫-৬৫) বছর ঃ উৎপাদনমুখিতা বনাম অচলাবস্থা
Seventh Stage (35-65 Years) : Generativity Vs. Stagnation

এই স্তরের ব্যক্তিরা সমাজ ও নিজের বংশধরদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তিত থাকে। এই সময় ব্যক্তিরা অন্যদের প্রতি দায়িত্বশীল হয় যা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই স্তরে পারিবারিক পেশা, সামাজিক জীবন সকলক্ষেত্রেই সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতার তাগিদ মানুষকে অগ্রগতিমুখে পরিচালিত করে। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ।

অন্যদিকে যদি সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে এক স্থবিরতা (Stagnation) সৃষ্টি হয়। তখন মানুষ সকল উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এক স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। জীবনের আনন্দ তারা হারিয়ে ফেলে এবং ধীরে ধীরে আরও একাকী হয়ে ওঠে।

অষ্টম স্তর (৬৫ বছরের পর) ঃ সততা বনাম হতাশা
Eighth Stage (Over 65 Years) : Intergrity Vs Despair

এই স্তরে তার কর্মজীবনের অবসর। সে তার জীবনকে ফিরে দেখতে ও পর্যালোচনা করতে থাকে। যারা তাদের অতীত জীবনের কর্মদক্ষতা, অন্যের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করে তারা জীবনকে ফিরে দেখার সময় আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করে। তারা জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে এবং এর সার্থক জীবনবোধ গড়ে তোলে। যখন ব্যক্তি জীবনের ওঠাপড়াকে সহজে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় তখন সে তার ফেলে আসা সময় ও জীবনের মানে বুঝতে পারে এবং এক সততার বোধে (integrity) পৌঁছায়। জীবনের অর্থ সার্থকভাবে বোঝাই হল প্রকৃত জ্ঞান (wisdom) বা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাবান হলে মানুষ মোহমুগ্ধ না হয়ে জীবনে কর্তব্য পালনে যথার্থভাবে সক্ষম হয় (Basic to a sense of integrity is wisdom, detached yet achive concern with life and its meaning)।

যারা জীবনে কর্তব্য পালনে অক্ষম, যারা অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক তারাই জীবনের সাফল্য ও হতাশাকে সহজে মেনে নিতে পারে না। এবং ফেলে আশা জীবনকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা কেবলই হতাশাগ্রস্ত (despair) হয়ে পড়ে এবং জীবন তাদের কাছে এক বিরাট শূন্য, বা অর্থহীন বলে মনে হয়। তারা প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (wisdom) থেকে বঞ্চিত থাকে এবং জীবনের অর্থ কখনোই তাদের কাছে উন্মোচিত হয় না।

শিক্ষায় মনো-সামাজিক বিকাশতত্ত্বের গুরুত্ব
(Importance of Psycho-Social Development Theory in Education)

এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশের মূলকথা হল ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ। এই পর্যায়ে মোট আটটি স্তরে বিভক্ত। এর মধ্যে ৪-৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে শিশুরা অনেকটা স্বীধানতা, আত্মনির্ভরতা ও ভাষার দক্ষতা অর্জন করে। এই সময় শিশুরা অনেক কাজের উদ্যোগ নিজে থেকে নিতে চায়। যদি শিক্ষালয়ে শিক্ষক স্বাধীনভাবে এইসব উদ্যোগে বাধা না দেন তবে তারা আরও অনুসন্ধিৎসু ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিবর্তে ক্রমাগত বাধা পেলে তাদের উদ্যোগের ইচ্ছাটা স্তিমিত হয়ে যায় ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়ে যায় যা তার শিক্ষার পক্ষে বাধাস্বরূপ।

মনো-সামাজিক বিকাশের মধ্যবর্তী পর্যায়টির স্থায়িত্বকাল ৬-১১ বছর বয়স যে সময়ে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এই সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দলবদ্ধ থাকার প্রবণতা এবং প্রবল বন্ধুপ্রীতি। অন্যদলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মনোভাব পায়, সাথে সাথে দলের হয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে শেখে। তাই এই সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার বদলে দলবদ্ধ শিখন ও শিক্ষণ অনেক বেশি কার্যকর। দলের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারে দলের প্রতি আনুগত্য থাকার ফলে।

তৃতীয় পর্যায়টি ১২-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল তারা নিজস্ব একটা আত্মপরিচয় (Self identity) লাভ করে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্তির আত্মপরিচয় লাভে সাহায্য করা। কেননা আত্মপরিচয় লাভের উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তি সমাজে নিজেকে কতটা অপরিহার্য বা মূল্যবান মনে করে এবং তার উপর তার পরবর্তী সামাজিক আচরণ নির্ভর করে। সুতরাং মনো-সামাজিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই সময়ের শিক্ষা পরিচালনার গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষ রাখতে হবে যেন কিশোর-কিশোরীরা কোনো কারণে হীনম্মন্যতার শিকার না হয় এবং তারা যেন সফল ও উদ্যমী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে শিখন ও শিক্ষণের মাধ্যমে।

শিশুর সামাজিক বিকাশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে তার সামাজিক আচরণ কেমন থাকে তার উত্তর পাওয়া যায় এরিকসন নামক মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বে। বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এরিকসনের মতে শিশুরা অনেক কিছু শিক্ষা পায় তাদের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাক্কালে। যেমন—আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self control), নিয়মনীতি (Rules), হারজিতের সাথে সংগতিবিধান (Adjustment with win and defeat), প্রেষণা (Motivation), সামাজিক দক্ষতা (Social skill), প্রক্ষোভ প্রশমন (Emotional catharsis) ইত্যাদি। একমাত্র দলযুক্ত শিখন ও শিক্ষণের মধ্য দিয়েই একজন শিশুকে সুস্থ সামাজিক নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিপরীতক্রমে বলা যায় ছোটোদের সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হলে তাদের শিক্ষাই সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Questions with Answer)

ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ কী?

ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিসত্তার লক্ষণগুলি হল—

(১) প্রক্ষোভের স্থিরতা
(২) উচ্চ বৌদ্ধিক সামর্থ্য সম্পন্ন
(৩) উচ্চমানের নৈতিক চরিত্র
(৪) সমাজের সঙ্গে উন্নতমানের সংগতি বিধানের ক্ষমতা
(৫) ঠান্ডা মেজাজ
(৬) বাস্তবমুখী চিন্তাধারা এবং সবিশেষ সাধারণ জ্ঞান
(৭) উন্নত পরিচালন ক্ষমতা, ইত্যাদি উপরিল্লিখিত লক্ষণগুলি যে ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পাবে তাকে ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বলা যেতে পারে।